ব্লন্ড হেয়ার
ব্লু আইজ

মূলঃ ক্যারিন স্লাথার

অনুবাদঃ ত্বাইরান আবির

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

ব্লন্ড হেয়ার ব্লু আইজ

মূলঃ ক্যারিন স্লাথার

অনুবাদঃ ত্বাইরান আবির

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১৯

প্রচ্ছদ
ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক
আমাদেরবই ডট কম
০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

অনলাইন পরিবেশক
AmaderBoi.com
Rokomari.com
Boibazar.com
Ittadishop.com
Boisomahar.com

মূল্যঃ ১৮০ [একশত আশি] টাকা

Blonde Hair Blue Eyes by Karin Slaughter, Translated by Tayran Abir, Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
Price: 180 Taka , 5 US$
ISBN: 978-984-34-6702-0

৪ই মার্চ, সোমবার ১৯৯১ সাল।

সকাল সাতটা বেজে ত্রিশ মিনিট।

নর্থ লাম্পকিন রোড, এথেন্স, জর্জিয়া।

সকালের ক্ষীণ আলোয় কুয়াশার ভাঁজে মিশে আছে ডাউন্টাউনের রাস্তাঘাট। রাস্তার পাশেই জর্জিয়া থিয়েটার। থিয়েটারের সামনে রঙবেরঙের ব্যাগ কাধে দাড়িয়ে আছে সারি সারি লোক। বারোটা বাজার আগে গেইট খোলা হবে না। তবুও থিয়েটার পাগল লোকগুলো সামনের দিকে আসন পাবার জন্য মরিয়া। ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই তৈরি হয়েছে বিশাল জটলা। তালা লাগানো দরজার কাছেই দুজন শক্তপোক্ত তরুণ প্লাস্টিকের চেয়ার এনে জড়ো করছে। চেয়ারগুলোর পায়ার কাছে পরে আছে বিয়ারের ক্যান, সিগারেটের মুখ। আরো আছে একটি খালি স্যান্ডউইচের ব্যাগ। খুব সম্ভবত বিপুল পরিমাণ চুরুট রাখা আছে ওটায়।

এমনই এক সকালে রাস্তা দিয়ে জগিং করতে করতে যাচ্ছিল জুলিয়া ক্যারল। তার দিকে চোখ পরে চেয়ারে বসা লোক দুটোর। যেতে যেতে জুলিয়া বুঝতে পারলো তার শরীরকে খুব তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছে তারা। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলো না সে। সোজা সামনের দিকে চললো। পরক্ষনেই ওই আগন্তুকদের চোখে তাকে কেমন দেখাচ্ছে এটা ভেবে খানিকটা বিরক্ত লাগলো তার। যদিও সে ভীতু স্বভাবের নয়। এসব নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করার মত মেয়েও নয়।

এথেন্স শহরটি জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বিখ্যাত একটি কলেজের জন্য সুপরিচিত। কলেজটি প্রায় আটশো একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। একই সাথে এথেন্স কাউন্টির বহু মানুষের কর্মস্থল। জুলিয়া এই শহরেই বেড়ে উঠেছে। গণসাংবাদিকতা বিভাগের একজন ছাত্রী ছিলো সে। ক্যাম্পাস থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রতিবেদন লিখতো। তার বাবা ছিলো অন্য একটি কলেজের ভেটেনারি সাইন্সের অধ্যাপক। জুলিয়ার

বয়স যখন উনিশ, তখনই সে বুঝতে পেরেছিল মাদকদ্রব্য এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি সুদর্শন একজন মানুষকেও এমন বানিয়ে দেয় যা কারো কাম্য নয়।

অথবা সে নেহাতই ভুল ভেবেছিল। একবার একটা ঘটনা ঘটেছিলো, হয়তোবা সেখান থেকেই তার এই ধারণা জন্মেছিল। এক রাতের বেলা একা একা সে পুরোনো কলেজের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ পেছন থেকে সে দ্রুত পায়ে কারো চলার আওয়াজ শুনতে পায়। তার মনে হচ্ছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে সন্তর্পণে। ভাবতেই ভয়ে বুক কেঁপে উঠলো তার। দৌড়ে পালাতে যাবে অমনি একটা কণ্ঠ তার নাম ধরে ডেকে উঠলো- জুলি!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো জুলি। পেছনে তাকাতেই দেখলো বায়োলজি বিভাগের ছাত্র এজাক্যাইল ম্যান দাঁড়িয়ে। একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। নাদুসনুদুস ছেলেটা হঠাৎ কিভাবে এমন হাড়ক্যাঙটা হয়ে গেল ওর মাথায় আসলো না। হাসতে হাসতে কাছে এগিয়ে আসলো এজাক্যাইল। জুলিয়ার সাথে নানা কথা বলতে শুরু করলো। নিজের ভাইয়ের গাড়ীর কথা বললো, তারপর মন্টি পাইথন কমেডি দলের কিছু কৌতুক শোনালো। হো হো করে হাসতে লাগলো দুজনেই। জুলিয়ার তাড়া ছিলো। জগিং করতে করতে একসময় সে তার হোস্টেলের সামনে পৌছে গেলো। ভারী কাঁচের দরজায় এজাক্যাইল ধাক্কা দিতেই তা খুলে গেল। জুলিয়া ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। বললো, 'আজকের মত চলি বন্ধু। আমি তোমাকে পরে ফোন করবো।'

তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। মনে মনে বললো- ও ঈশ্বর, আমি যেন ওর হৃদয় ভাঙার কারণ না হই। জুলিয়া দেখতে সুন্দরী। শৈশবেই সে তা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ঈশ্বরের দেয়া অপার সৌন্দর্যের এই উপহার গ্রহণ করার চেয়ে সবসময় বরং তা বোঝা বলে মনে হয়েছে তার কাছে। তার ধারণা সুন্দরী নারীদের নিয়ে লোকদের আলাদা আলাদা ভাবনা আছে। তাছাড়া বেশকিছু বাজে কথাও প্রচলিত আছে। যারা সুন্দরী, তাদের চরিত্র ভালো হয় না। অনেকেই এমন বলে। মুভি দেখতে পছন্দ করতো জুলিয়া। মাঝেমধ্যে সেখানেও এসব কথার সার্থক প্রয়োগ দেখতে পেত। পরিচালক জন হিউজের চলচ্চিত্রগুলোতে প্রায় দেখা যেত সুন্দরী নারীদের দুশ্চরিত্রা হিসেবে উপস্থাপন করা হত। কিছুক্ষেত্রে সাজাও দেখানো হত। তাছাড়া

অনেকের ধারণা সুন্দরী নারী হচ্ছে ট্রফির মতন, অর্থ উপার্জন ও সমাজে প্রতিপত্তি স্থাপন করার পর সুন্দরী নারী নামক এই ট্রফি না পেলে চলেই না পুরুষের। অবশ্য ছেলেরা সুন্দরী মেয়েদের একটু বেশিই ভয় পায়। বিশেষ করে প্রেম করবার ক্ষেত্রে। যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, যদি অপমান করে তাড়ায় এসব ভেবে লজ্জায় তারা নুইয়ে যায় লতার মতন। এতসব কারণে এই উনিশ বছর বয়সেও সে সতী সাবিত্রী রয়ে গেছে। যদিও তার ছোট বোন এমন নয়।

কলেজ জীবন একটু আলাদা হয়। বেশ মজার হয় এমনটাই সবার ধারণা। ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে নিজের জীবন কাটায়। ইচ্ছেমত ঘোরাফেরা করে। জুলিয়ারও তেমন ধারণা। সে স্বেচ্ছাধীনভাবে তার জীবন কাটাতে চায়। হোস্টেল থেকে তার পারিবারিক বাসার দুরত্ব এক মাইলেরও কম। বাড়ির বাইরে এভাবে একা থাকাটাই তাকে নতুন করে গড়ে তুলেছে। সবসময় সে যেমন চাইত ঠিক তেমন। সুখী, আত্মবিশ্বাসী, শক্তিশালী এবং নিজের যা আছে তা ই নিয়ে সন্তুষ্ট একজন মানুষ (কিন্তু কুমারী নয়)। যেখানে সারা পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে ঘরে বসে থাকার মত মানসিকতার মেয়ে নয় জুলিয়া। সে নিয়মিতই টেনিস ক্লাবে যায়, দুঃসাহসী সব বন্ধুদের সঙ্গ দেয়। তবে কোন নির্দিষ্ট গন্ডিতে আবদ্ধ হয় না। সবার সাথেই তার ভালো সম্পর্ক, সবার সাথেই কথাবার্তা বলে। আগন্তুক দেখলেও তার মুখে হাসি ফোটে। ছেলেদের সাথে প্রায়ই সে ঘুরতে বেরোয়।

সবকিছু ঠিকঠাক চলছিলো। কিন্তু তারপরই হঠাৎ একদিন বেট্রিস অলিভার নামের এক মেয়ের সাথে ঘটা মর্মান্তিক এক ঘটনা তার সামনে এলো। একদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সেসব নিয়েই ভাবছিল সে।

ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়া ক্যাম্পাসের নিয়মিত প্রকাশনা রেড এন্ড ব্ল্যাকের টেলেক্স মারফত সে ঘটনাটি জানতে পেরেছিল। বেট্রিস অলিভার উনিশ বছর বয়সী সুন্দরী এক মেয়ে। মাথায় সোনালী চুল, নীলাভ চোখের এই কলেজ ছাত্রী দেখতেও অনেকটা জুলিয়ার মত। এক কথায় খুব সুন্দর।

পাঁচ সপ্তাহ আগের কথা। রাত প্রায় দশটার দিকে বাড়ি থেকে বের হয় বেট্রিস। এরপর আর ফেরেনি। বাবার জন্য আইসক্রিম কিনতে হেঁটে দোকানের দিকেই যাচ্ছিল সে। যদিও জানা যায় তার বাবা দাঁতের ব্যথায়

ভুগছিলেন। এই বিষয়টাই জুলিয়াকে হতভম্ব করে ফেলল। একজন দাঁতের ব্যথায় ভোগা রোগীর জন্য মেয়েটা ঠান্ডা আইসক্রিম আনতে গেল কেন? বিষয়টা সন্দেহজনক। কিন্তু পরিবার থেকে পুলিশকে এমনটাই জানানো হয়েছে। আর সেজন্যই কথাটা লিপিবদ্ধ হয়েছে সংবাদপত্রে। এবং ঘটনাটি শেষমেশ প্রিন্ট মাধ্যমে এসেছে, কেননা বেট্রিস অলিভার আর বাড়ি ফেরেনি।

হঠাৎ করে তরুনীদের এই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিয়ে জুলিয়া বেশ চিন্তিত ছিল। রেড এন্ড ব্ল্যাক পত্রিকার জন্য এই ঘটনাগুলো নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে চাইছিল সে, কিন্তু সত্যি বলতে নিজের সমবয়সী কোন একজন মেয়ে ঘরের বাইরে বেরোচ্ছে, কিন্তু আর ফিরে আসছে না, বিষয়টা তাকে খুব আতঙ্কিত করে ফেললো। যাইহোক, অলিভারের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হলো জুলিয়া। সিদ্ধান্ত নিলো বেট্রিস অলিভারের বাবা-মার সাথে কথা বলবে, আরো কথা বলবে বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে। তাছাড়া নিখোঁজ হবার আগ মুহূর্তে যে স্থানে সে ছিলো সেখানকার লোকেদের সাথে কথাবার্তা বললে নিশ্চয়ই তার হুট করে নিখোঁজ হওয়া নিয়ে নানা তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

‘ঘটনার মোটিভ দেখে এটা আমার কাছে অপহরণ বলে মনে হচ্ছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি বিষয়টার সুরাহা করতে।’

সংবাদটির একেবারে নিচের দিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত গোয়েন্দার মন্তব্যটা লেখা ছিলো। অলিভারের সকল জিনিসপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য পুলিশের হেফাজতে নেয়া হয়েছে। মেয়েটির পার্স, ড্রয়ারে রাখা টাকা এবং বাড়ির বাইরে পার্কিং লটে রাখা গাড়িটাও চেক করে দেখা হবে। তার বিষয়ে সবচাইতে গা হিম করা কথাটি এসেছে তার মায়ের মুখ থেকে। তিনি বলেছেন, ‘আমার মেয়ে ফিরে আসেনি, আসবেও না। তাকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে।’

তুলে নিয়ে গেছে? হতেও পারে।

অলিভারের পরিবার, জীবনযাপন ও স্বাধীনতা বিশ্লেষণ করে পাওয়া তথ্য নিয়ে নানা ভাবনায় পরে গেল জুলিয়া। শৈশবে জুলিয়া অনেক গল্পের বই পড়েছিল। ওগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ছিল লিকলিকে রোগা ভুতপ্রেত ও

নেকড়ের বই। হুট করে মানুষের উধাও হওয়া নিয়ে অনেক গল্প পড়া হয়েছে তার। ভুতুড়ে কেউ হঠাৎই যে কাউকে তুলে নিত। কিন্তু বাস্তব জীবন রুপকথার মত নয়। জুলিয়া এটা ভালো করেই জানে। কাউকে গুম করাটাও সহজ কাজ নয়। সবমিলিয়ে এই কেস নিয়ে এখনই যেকোন কিছু বলা যাচ্ছে না।

অলিভারের বন্ধু, প্রতিবেশী কিংবা প্রেমিক যে বা যারা আছে তাদের সবার সাথে মুখোমুখি কথা বলতে চায় জুলিয়া। একাকী। সঙ্গে থাকবে কেবল একটা খাতা ও কলম। হয়ত এদের কারো কাছ থেকে জানা যাবে অলিভারকে কেউ আতঙ্কিত দেখেছিল কিনা।

বুকের মধ্যে হাত গুটিয়ে নিলো জুলিয়া। নিজেকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করল সে। তারপর রাস্তার চারদিকে একটু তাকাল। শরীরটা কেন জানি খুব দুর্বল লাগছে। তিরতির করে কাঁপছে চোখ দুটো। অস্থির লাগছে। নিজের ভেতর থেকে দুশ্চিন্তা দূর করতে চেষ্টা করল সে। বড় বড় শ্বাস নিতে থাকল। হয়ত অলিভারের সাক্ষাৎ আর পাওয়া হবে না। তবে তার ব্যাপারে কারো সাথে কথা বলার আগে তাকে সবকিছু সাজিয়ে নিতে হবে। কেননা, একজন সাংবাদিক অবিরতভাবে মানুষকে প্রশ্ন করে সব জেনে নেয়, কিন্তু একজন ফিচার লেখককে (জুলিয়ার বিভাগ) সবকিছু প্রমাণ, সংশ্লিষ্ট তথ্য যোগ করে লিখতে হয়। প্রতিবেদনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে তার কাজে সবচাইতে বড় বাধা হতে পারে গ্রেগ জিয়ানাকোস, যে কিনা রেড এন্ড ব্ল্যাকের শিক্ষানবিশ বিভাগের প্রধান সম্পাদক। লোকটা ধূর্ত। নিশ্চয়ই তাকে এসব নিয়ে নানা ফর্দ শুনিয়ে দেবে।

যদিও সে গ্রেগ জিয়ানাকোসকে উৎরে যায়, তাহলে লিওনেল ভেন্স আর গ্রেগ মিনিয়নও জিয়ানাকোসের অনুসরণ করবে। তারপর সর্বশেষ বাধা হবে রেড এন্ড ব্ল্যাকের ফ্যাকাল্টি এডভাইজর মিস্টার হান্না। এমনিতে লোকটা বেশ ভালো। কিন্তু অপরাধ বিষয়ক নিউজের চেয়ে, পত্রিকার বিশ্বব্যাপী খেলাধুলা অংশে মেক্সিকোর পর্বতে ডাইভ দেয়ার খেলার খবর ছাপতে বেশি আগ্রহী তিনি।

নানাকিছু ভাবতে ভাবতে নীরব পিচঢালা রাস্তা ধরে এগোতে লাগল সে। প্রতিবেদনটার শিরোনাম কি হতে পারে সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলো তারপর।

বাবা-মার সাথে বসবাসরত বেট্রিস অলিভার নামের উনিশ বছর বয়সী সুন্দরী এক তরুণী নিখোঁজ...........

নাহ্, কেমন যেন শোনায় বাক্যটা। তাহলে? হারিয়ে যাওয়া এক তরুণী! এটাও না। কারণ অলিভার একা নয়, শহরজুড়ে নিখোঁজ হয়েছে আরো অনেক মেয়ে।

রাতের বেলা এক তরুণী দোকানের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ....

জুলিয়া চারদিকে তাকাল। মনে হলো পেছন থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসলো। থমকে দাঁড়ালো সে। কেউ একজন তাকে অনুসরণ করছে মনে হলো। পিচের রাস্তায় জুতো ঘষতে ঘষতে চললে যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমন শব্দ শোনা গেল। ভয় ঢুকে গেল তার মনে। এক ঝটকায় পেছন ফিরে তাকালো জুলিয়া। কাউকে দেখতে না পেয়ে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর ভালো করে চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করে নিলো। দূরে বাড়ির জানালার ভাঙা কাঁচ, রাস্তায় পরে থাকা বোতল এবং জীর্ণ সংবাদপত্রের কাগজ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না সে। অন্তত আতঙ্কিত হবার মত কিছুই নেই।

তাই নির্ভয়ে ফের সামনে এগোতে লাগলো জুলিয়া। গলিপথের বাড়ির দরজার পাশগুলো ঘেঁষে ধীরে ধীরে সতর্কভাবে হাঁটতে লাগল। মাঝেমধ্যে রাস্তা বদল করছে যাতে পাশে থাকা ময়লার স্তুপের ওপর পরে না যায়। এক সময় হোস্টেলে পৌছে গেল। বিরক্ত লাগছে জুলিয়ার। সবই মনের ভয়।

রিপোর্টাররা সাধারণত যেকোন ঘটনা কঠোর দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, আবেগগুলোকে কোনরকম প্রশ্রয় দেন না। কিন্তু জুলিয়ার ক্ষেত্রে অন্যরকম হচ্ছে। অলিভারের ঘটনা জানার পর থেকে ঘটনাটি নিয়ে তার মনে নানারকম চিন্তাভাবনা উঁকি দিচ্ছে। সেটা অলিভারেরর জন্য নয়, জুলিয়ার প্রচন্ড কল্পনাশক্তির জন্য। এই যেমন- বেট্রিস অলিভার রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। অন্ধকার রাত। চাঁদ ছিলো মেঘে ঢাকা। ঝিরিঝিরি বাতাস বইছিল। হঠাৎ সে জ্বলন্ত এক সিগারেটের আভা দেখতে পেল সে। ঠক্ ঠক্ করে জুতোর শব্দ

শুনতে পেল, কেউ একজন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। থমকে দাঁড়ালো অলিভার। পেছনে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না তার। পরক্ষণেই সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ পেল। হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করে কাঁপতে লাগলো। শরীর হিমশীতল হয়ে আসলো ভয়ে। দৌড়ে পালাবে নাকি চিৎকার করবে বুঝতে পারছিল না। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পেছনে থেকে কেউ একজন গলায় ছুরি ধরলো। ভয়ের স্রোত বয়ে গেল অলিভারের দেহে। আতঙ্কে গলা শুকিয়ে এলো। চিৎকার করার কোন সুযোগ মিললো না। শক্তিশালী লোকটা তার এক হাতে ছুরি, অন্যহাতে তার মুখ চেপে ধরেছিল। তারপর আগন্তুক জোর করে গাড়িতে উঠিয়ে গোপন কোন স্থানে নিয়ো গেল, যেখানে নিরাপদে থাকা যায়। তারপর? তারপর সব শেষ।

এমন সব ঘটনা জুলিয়ার মনে পরতে লাগলো সময়ে সময়ে। এমনটা হলেও হতে পারে, মনে মনে ভাবল সে।

জুলিয়ার মা যদি একজন লাইব্রেরিয়ান না হতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এমন ভয়ংকর চিন্তাভাবনার জন্য জুলিয়ার পড়া বইগুলোর দোষ দিতেন। বেশ ভয়ঙ্কর সব বই পড়তো সে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- দ্য স্ট্রেঞ্জার বিসাইড মি, হেল্টার স্কেলটার, দ্যা সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্ব, ওয়াচিং আওয়ার। কিন্তু তার মা ছিলো একজন লাইব্রেরিয়ান। তাই তিনি বড়জোর তাকে এমন বইগুলো পড়তে বারণ করতেন যা তাকে ভয় পাইয়ে দেয়।

এভাবে ভয় পাওয়াটা কি তাহলে জুলিয়াকে বিপদে ফেলবে?

কপাল থেকে ঘাম মুছলো সে। তার হৃৎপিণ্ড এতটাই কাঁপছিল যে, শার্টের ওপর দিয়ে সে তা দেখতে পেল। টেবিলে পার্সের কাছে গেল সে। তার গান শোনার ওয়াকম্যান একটা হলুদ স্কার্ফের সাথে প্যাচানো। স্কার্ফটা মূলত তার বোনের জন্য রাখা। ওটা সে তার বোনকে কথা দিয়েছিল বাসায় গিয়ে রেখে আসবে। ট্যাপের প্লে বাটনে আঙুল রাখলো জুলিয়া, কিন্তু চাপতে মন চাইছে না। সে কেবল ট্যাপের ভেতরে থাকা ক্যাসেটটা নিয়ে ভাবছে, এক ছেলে তাকে এটা উপহার দিয়েছিলো।

তার নাম রবিন ক্লার্ক।

দু'মাস আগে জুলিয়ার সাথে তার পরিচয় হয়। মাঝেমধ্যে তাদের দু'জনের মধ্যে নোট বিনিময় হত, কখনোবা ফোনে পড়াশোনা নিয়ে কথা হত, দলবেঁধে তারা ঘুরতে বেরোতো। মাঝেমধ্যে চোখাচোখি হত দুজনের। সেখান থেকে হৃদয় দেয়া নেয়া, একসাথে রাস্তা ধরে হাঁটা। তারপর একদিন ছেলেটি তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, সদ্য যৌবনে পা রাখা জুলিয়ার শরীরে তখন শিহরণের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। একবার জুলিয়া তাকে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। বাবা-মার সাথে দেখা করিয়ে দেবার জন্য নয়, লন্ড্রি করার মেশিনটা চালু করার জন্য। রবিনের নাম শুনেই জুলিয়ার ছোটবোন খিলখিল করতে হাসছিল, কেননা রবিন নামটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েদের রাখা হয়। জুলিয়া চিমটি কেটে সেদিন কোনমতে তার ছোটবোনের হাসি থামিয়েছিল।

ট্যাপের ক্যাসেটটি রবিন বানিয়েছিল জুলিয়ার পছন্দের সব গান দিয়ে। তাই স্টিক্স এন্ড শিকাগো, মেটালিকার মত ব্যান্ডের গ্যানগুলোর বিপরীতে সেখানে জায়গা করে নিয়েছিল বেলিন্ডা কারলিসলে, উইলসন ফিলিপস, জেমস টেইলরের মত গায়কদের গান সহ মেডোনার মত ব্যান্ডদলের বেশকিছু গান। কারণ রবিনের ধারণা ছিল মেডোনা ব্যান্ডের গানগুলো জুলিয়ার বেশ পছন্দ।

জীবনে সেই প্রথমবার জুলিয়া কোন ছেলের কাছ থেকে ট্যাপ উপহার পেয়েছিল। ছেলেটাও তাকে একান্ত আপন করে পেতে চাইত। জীবনের বেশকিছু সময় জুলিয়া কাটিয়েছে ড্রাম, গিটারবাদক ছাড়াও এমন কিছু শিল্পীদের সাথে যারা পৃথিবীর কাছে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ করবার আগেই মারা গেছে (শুধু মিক্স করে বানানো এই ক্যাসেটদাতার সাথেই নয়)।

তবে রবিন চাইত না জুলিয়া প্রেমের অভিনয় করুক। সে জুলিয়াকে ভালোবাসতো। একেবারে নিজের করে পেতে চাইতো। এমন হয়ে গেলে কলেজের উইমেন্স স্টাডিজের শিক্ষক নিশ্চয়ই হার্ট এট্যাক করে মারা যেতেন। কেননা, তিনিও জুলিয়ার প্রতি দূর্বল ছিলেন। অপরদিকে শুধু রবিনই নয়, জুলিয়াও তাকে মনেপ্রাণে চাইতো।

'রবিন।'

স্নিগ্ধ এক সকালে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে ডাকল জুলিয়া। এভাবে রবিনের নাম ধরে ডাকতে তার ভালো লাগতো।

রবিন বাইশ বছরের এক যুবক। দীর্ঘকায় ও চওড়া বক্ষের অধিকারী। বাবার হোটেলে খেয়েদেয়ে বেশ একখান দেহ বানিয়েছে। চুলগুলো বাদামি এবং চোখদুটো নীলচে রঙয়ের। জুলিয়ার দিকে যখন সে তাকায়, অদ্ভুত একটা অনুভূতি তাকে ছুঁয়ে যায়।

রবিন ছাড়াও পূর্বে বেশকিছু ছেলের সঙ্গ পেয়েছিল জুলিয়া। তারাও রবিনের মতই বয়স্ক ছিল (যদিও বয়সের তুলনায় পরিপক্ব ছিলো না)। তারা জুলিয়ার বিষয়ে অত ভীত ছিলো না। কেননা তাদের পকেট ভরা টাকা ছিলো। গাড়ি-বাড়ি ছিল। জুলিয়ার বাবা তাকে বলতো এসব ছেলেরা একটা জিনিসই চায়। আর তা হলো শরীর। যদিও তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি জুলিয়া নিজেও শরীরের স্বাদ পেতে মরিয়া।

জুলিয়ার জীবনের সাথে আরো একটি ছেলের নাম জড়িয়ে ছিলো। তার নাম ব্রেন্ট লকউড। তার সাথে সুখময় স্মৃতি ছিল জুলিয়ার। জুলিয়ার বয়স তখন পনেরো ছুঁইছুঁই, আর ব্রেন্ট সতেরো বছরের যুবক। একদা সে জুলিয়াকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে যাবার অনুমতি চায় জুলিয়ার বাবার কাছে। কিন্তু জুলিয়ার বাবা তাকে অপমান করে তাড়ায়। বলে, আগে নিজের চেহারার হাল ঠিক করো, কাজ জোটাও তারপর তাকে নিয়ে যেও। আমার আপত্তি নেই।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে যায়। হঠাৎ একদিন ব্রেন্ট তার এলোমেলো চুল ঠিক করে, কাজের সংবাদ নিয়ে জুলিয়ার বাসায় আসে। জুলিয়ার বাবা মা তাকে দেখে অবাক হয়ে যান। তার ছোটবোনও এতে খুশি হলেও জুলিয়া খুশি হতে পারেনি। ব্রেন্টের চুলগুলো তার খুব প্রিয় ছিলো। তাছাড়া জুলিয়া ছিল ভেজিটেরিয়ান। কিন্তু ব্রেন্ট মাংসও খায়। নিজেদের এতসব অমিল নিয়ে একসাথে থাকাটা দুষ্কর।

তারপরও জুলিয়া মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। কারণ ব্রেন্ট ছিলো সুদর্শন এবং সবাই জানে বহু মেয়েই তার ভালোবাসা পেতে ব্যাকুল ছিলো। কাজেই ব্রেন্টের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে থাকাটাও জুলিয়ার জন্য ছিল আত্মতৃপ্তির ব্যাপার। সে সবসময় চাইতো একজন বাস্তববাদী মেয়ে হতে। যদিও সবাই

তাকে এমনই ভাবতো, কিন্তু সে তেমন ছিলো না। সে হতে চাইতো অভিজ্ঞ এক মেয়ে, যে কিনা আঙুলের ইশারায় ছেলেদের নাঁচাতে পারবে।

ওদিকে ব্রেন্ট সত্যি সত্যিই তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তার সাথে মহৎ এক সম্পর্ক গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু তার মুখশ্রীতে সরল প্রেমের আভাস জুলিয়ার কাছে বিরক্তিকর মনে হত।

এদিক দিয়ে রবিন ক্লার্ক এগিয়ে। কোন ব্যাপারেই তাকে বিরক্তিকর লাগতো না জুলিয়ার। সে দেখতে ছিলো সুন্দর, তার দেহের লাবণ্য ছিল দেখার মত। জুলিয়ার সাথে কথা বলার সময় সে পুরোটা সময় তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। তার কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শুনতো। জুলিয়ার বলা কৌতুক শুনে সে হাসতো (অন্তত হাসির মত কৌতুক না হলেও)। তার এই মনোযোগী শ্রোতার স্বভাবটা জুলিয়ার খুব ভালো লাগতো। রবিন সবসময় স্বপ্ন দেখত একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হবে। যদিও সে আদতেই একজন শিল্পী হয়ে উঠেছিল (বাবার বেকারীতে তার কাজ ছিল অস্থায়ী)। জুলিয়া তার বেশকিছু কাজ দেখেছিল। এর মধ্যে একটা ছবি ছিলো এমন- পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণা নামছে, লাল আভার সূর্য উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে পড়ন্ত বিকেলে, নিচে জুলিয়ার কোমড়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। এই চিত্রটা সে ন্যাপকিনের মধ্যে এঁকেছিল। স্টুডেন্ট সেন্টারে কফি খাবার সময় রবিন তাকে এটা দেখিয়েছিল। ছবিটা দেখে জুলিয়া রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিল। ছবিটা একেবারে মনমত হয়েছে, বলেছিল রবিন। আড্ডা শেষে দাঁড়ানোর সময় জুলিয়ার হাঁটুতে কম্পন অনুভূত হয়েছিল, ঘেমে গিয়েছিল হাতের তালু। রবিনের বাহুতে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিল সে। সেদিন আলতো হাতে রবিন ছুঁইয়ে দিয়েছিল তার চোখমুখ।

‘চুমু খেতে ইচ্ছে করছে আমার।’

জুলিয়ার কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছিল রবিন। রবিনের সাথে সেসব স্মৃতি খুব আনন্দের।

হাঁটতে হাঁটতে বাস্তুহারাদের ত্রাণ বিতরণের গাড়ির সামনে এসে পৌছালো জুলিয়া। একজন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখানে কাজ করে সে। হিউল এবং ওয়াশিংটনের মাঝামাঝি এক জায়গা এটি। কোন এক অজানা কারণে জায়গাটার নাম হয়েছে হট কর্ণার। লোকেরা সকালের খাবার সংগ্রহ করার জন্য ইতিমধ্যেই লাইনে দাঁড়িয়েছে। বেশিরভাগই পুরুষ, অল্পকিছু মহিলাও আছে। লাইনের মধ্যে নড়াচড়া করছে তারা, মাথা নিচু হয়ে আছে, হাত ঢুকানো পকেটে। তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, তারা দান দক্ষিণা নিতে চাচ্ছে না, কিন্তু খুব দরকার, তাই একবেলা খাবার পাবার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।

‘শুভ সকাল।’

জুলিয়ার উদ্দেশ্যে বললো ক্যানডিস বেনডার। সে কন্টেইনার থেকে ডিম, বেকন এবং টোস্ট বিস্কুট বের করায় ব্যস্ত ছিল। বড় ভ্যানে করে পরিবেশন করা হচ্ছিল কফি।

‘দূঃখিত, একটু দেরি হয়ে গেছে।’

যদিও তার দেরি হয়নি। তবে কারো সাথে কথা বলার শুরুটা ক্ষমাসুলভ ভাবে শুরু করা জুলিয়ার স্বভাব। সে ভ্যান থেকে কম্বল তুলে নিয়ে লোকদের মাঝে বিতরণ করতে লাগল। কেউ একজন নেই।

‘মুনা কোথায়?’

বলল ক্যানডিস। জুলিয়া লাইনের কাছে গিয়ে একে একে সবাইকে দেখতে লাগল। পরখ করতে লাগল প্রত্যেকের চেহারা। হঠাৎ ভয় হতে লাগল তার। ক্যানডিস হাঁক দিল, 'মুনাকে দেখতে পাচ্ছো না?'

জুলিয়া না সূচক ঘাড় নাড়াল। লোকজন চলে যাচ্ছে দেখেও সে অনেকক্ষণ খোঁজার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনভাবেই মন থেকে ভয় তাড়াতে পারলো না। মুনা দেখতে যুবতী, জুলিয়ার থেকে কেবল কয়েক মাসের বড় হব বয়সে। অন্যান্যদের মেয়েদের তুলনায় দেহের অনেক বেশি যত্ন নিত সে। বারবার গোসল করে পরিপাটি থাকত, সুন্দর জামা পড়তো। কেননা নেশার কাজে সে কখনো টাকা ব্যয় করতো না। নিজের আঠারোতম জন্মদিনে পরিত্যক্ত হয় সে। এখন জীবন বাঁচাতে নানা কিছু করছে। জুলিয়া যখন তার বংশের নাম জিজ্ঞেস করেছিল সে বলেছিল, 'আমার কোন নাম নেই।'

'মুনা-নামবিহীন তাহলে।' জুলিয়া হেসে বলেছিল।

'মুনা এখানে গতরাতে ছিলো না।' কম্বল নেবার সময় লাইনে দাঁড়ানো এক মহিলা বললেন। জুলিয়া জিজ্ঞেস করল,

'শেষ কখন তুমি তাকে দেখেছো?'

'ঠিক মনে নেই।'

তারপর আর তারা একে অপরের দিকে তাকাল না। পাশেই প্রতিযোগিতা চলছে, গল্পেকথার প্রতিযোগিতা। এসব দেখে স্কুল জীবনের কথা মনে পরে গেল জুলিয়ার। তখন বান্ধবীরা সবাই জটলা হয়ে নানান কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। শিক্ষকের গৃহপালিত পশুর কথা, ভালো ও খারাপ মেয়েদের নিয়ে কত কত কথা!

মুনা ছিলো দুশ্চরিত্রা। সে সুন্দরী ছিল, পুরুষের মন ভুলাতে সজ্জিত হত। তাকে দেখলে আশ্রয়হীন মনে হত না কখনোই। ডেলাইলাও এক পতিতা। মুনার চেয়ে সে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ। সত্যিকার অর্থেই সে পতিতা ছিলো। ইত্যাদি নানা আলোচনা করছে মহিলারা।

এই মুহূর্তে এখানে সাত আটজন মহিলা একসাথে বসে গল্প করছে। তারা কেউই বেট্রিস অলিভারের মত নয়, যে কিনা তার বাবার জন্য আইসক্রিম আনতে গিয়ে আর ফেরেনি। তার সাথে এসব মহিলার তুলনা চলে না। কেননা, অলিভারের ঘরবাড়ি ও পরিবার ছিল, কিন্তু এরা বাস্তুহারা। জুলিয়া লক্ষ্য করেছে পরিবারহারা মহিলাগুলো পতিতাবৃত্তিতে ব্যস্ত, নেশাগ্রস্ত। ক্ষুধা, ভয় এবং একাকীত্ব তাদের ওপর জেঁকে বসেছে প্রচন্ডভাবে। কিছুক্ষণ পরই ডেলাইলার সাথে দেখা হলো জুলিয়ার। সে তাকে মুনার কথা বললো। ডেলাইলা বললো,

'আমি গতরাতে মুনাকে বনে যেতে দেখেছিলাম। সম্ভবত দশ কি এগারোটা বাজে, বৃষ্টি আসার ঠিক পূর্বেই।'

জুলিয়া কথাটা শুনে মাথা নাড়াল।

ডেলাইলা চিৎকার করতে লাগল। শুনে জুলিয়ার কানে তালা লাগার জোগাড় হলো। এটা বিদ্রুপের হাসি নাকি ভয়ের জুলিয়া তা বুঝতে পারলো না। ডেলাইলা নেশা করে, পুরোমাত্রায় একজন নেশাগ্রস্ত সে। রাস্তায় রাস্তায় বড় হয়েছে। এখানে জুলিয়া স্বেচ্ছাসেবী হয়ে আসার আরো আগে এসেছে সে। নিজের পকেটে ছোটবেলার একটা ছবি ছিলো ডেলাইলার। সেটা বের করে দেখতে লাগল। গত চার বছরে জুলিয়া স্কুল পাশ করেছে, কলেজে উঠেছে তারপর রেড এন্ড ব্ল্যাকের ফিচার বিভাগে সম্পাদক পদে পদোন্নতি পেয়েছে।

অন্যদিকে একই সময়ে ডেলাইলা বারবার নিষ্পেষিত হয়েছে। রাতের আঁধারে সম্ভ্রম বিলিয়ে দিয়েছে অজস্রবার। জীবনের মারপ্যাচে পরে পুষ্টির অভাবে একদা সে তার সব দাঁত হারিয়েছে। চামড়ার রঙ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সম্ভবত এইডস হয়েছে, অনুমান করলো জুলিয়া। কিন্তু বেশি শব্দ করে বলল না। কেননা এইডস হওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। তাদের দুজনের মাঝে ক্যানডিস এসে হাজির হলো। বললো,

'বনে একদল লোক এসেছে। দেখতে পেয়ে গতকাল আমি সেখানে গিয়েছিলাম তাদের সাহায্য লাগবে কিনা জানার জন্য। কিন্তু তারা বিষয়টাকে বেহুদা মজা মনে করলো।'

জুলিয়া কি যেন ভাবল। তারপর ফের কাজে মনযোগ দিল। আর্মি পোশাক পরা এক লোককে জুলিয়া কম্বল হাতে তুলে দিল সে। লোকটার কালো ক্যাপের ওপর লেখা- 'ভিয়েতনাম এম আইয়ের সেবাদানকারীরা কখনো হারতে শেখেনি।'

ব্যাপারটা বেশ সুন্দর। মনে মনে ভাবল জুলিয়া। তারপর ক্যানডিসের দিকে তাকাল। বললো, 'লোকগুলো দেখতে কেমন? তারা কি ক্যাম্পিং করছিলো?'

এই সপ্তাহে পরিবারের সাথে ক্যাম্পিংয়ে গিয়েছে রবিন। জুলিয়াকে সাথে নেয়নি, কেননা পরিবারসুদ্ধ লোকের সাথে ডেটে যাওয়াটা অস্বস্তিকর।

'মুনার অদৃশ্য হওয়াটাও আমাকে এতটা চমকে দেয়নি, যতটা দিয়েছে এই ক্যাম্পিংয়ের লোকগুলো। শেরিফ তো ওদেরকে ভুত ভাবতে শুরু করেছে।'

বলেই হাসতে লাগলেন ক্যানডিস। জুলিয়ার মার মত ক্যানডিসও জাতে একজন হিপ্পি ছিল। পুনরায় তিনি বললেন,

'তারা সকলেই ছিল তোমার সময়বয়সী। তোমার মত কাপড় পরে, কথা বলে, আচরণ ও এক।'

জুলিয়া মাথা ঝাকাল। অনেকটা চার্লস ম্যানশনের শো এর মত।

'কিন্তু মুনা কেন তাদের সাথে যাবে? না যাবারই বা কোন কারণ আছে?' মনে মনে ভাবতে লাগলো সে।

খাবার বিতরণ শেষে ক্যানডিস কম্বলগুলোর দিকে মনযোগ দিলেন। জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাদের পরিকল্পনা হলো মাউন্ট কাথাডিয়ামের পথ ধরে হাঁটা। যদিও তা আমার কাছে লুকানোর অযুহাত হিসেবেই মনে হলো।'

'আমিও যাব। কোথায় ক্যাম্পিং করেছে তারা?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

‘উইশিং রকের ঠিক পাশেই।’

তার মানে রবিন ও তার পরিবার যেখানে ক্যাম্পিং করার কথা ছিল ঠিক সেখানেই।

‘বাসা থেকে বেরিয়ে দুনিয়াবি সব বিষয়াদি বাদ দিয়ে জীবন যাপন তোমার ভালো লাগে? এটা নিয়ে তোমার মতামত কি জুলি?’

ক্যানডিস জিজ্ঞেস করলেন। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। তবে মানুষের মন নিয়ে খেলা করার মত চমৎকার গুণটি এখনো তার মাঝে রয়েছে।

জুলিয়া প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। বলল, ‘যারা এমন করে তাদের ইচ্ছে শক্তি স্বাধীন। বিষয়টা রোমাঞ্চকর তাই না?’

ক্যানডিস হাসলেন। যথার্থই বলেছে জুলিয়া।

আবর্জনার বাক্স থেকে জুলিয়া ছাঁইয়ের বস্তা হাতে নিল। তারপর টিনের কৌটা ও কফির কাপ সংগ্রহ করতে চলে গেল। লোকেরা চারপাশ নোংরা করে ফেলে। কেন জানি এসব পরিস্কার করতে জুলিয়ার কোন ইতস্তত বোধ হয় না। যদিও তার অলস ছোটবোনটা এসব দেখলে নিশ্চিত নাক সিটকাতো।

পনের বছর বয়স থেকেই সে এখানে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে আসছে। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। বিরক্তিকর এক সময়। তার ওপর পড়ার মত কোন বই তার হাতে ছিল না। তার ছোটবোন তাকে পাগল করে তুলত। ঘরের মাঝে বসে বসে অবস্থা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছিল তার। অপেক্ষা করছিল কখন পরিণত বয়স আসবে, স্বাধীনভাবে বাইরে বেড়াতে পারবে।

একদিনের কথা। গাড়ি করে বাস্তুহারাদের আশ্রয়ের দিকে আসার আগে বাবা তাকে বলল, ‘চলো দেখে আসি তোমার মনমত কিছু পাই কিনা।’

‘কি?’

হতভম্ব হয়ে জবাব দিয়েছিল জুলিয়া। কেননা তখনও সে বুঝতে পারে নি এই ‘কিছু’ শব্দটার মানে। বুঝতে পারেনি তার বাবা তাকে নিয়ে যাচ্ছে এমন এক জায়গায় যেখানে সে বাস্তুহারা লোকদের সাথে দারুণ সময় কাটাতে পারবে।

এই আশ্রয়স্থল জুলিয়ার জীবনে নতুন এক অধ্যায়। এক ক্রিসমাসে যখন তার পিতামাতা বেশকিছু উপহার বাসায় এনে সকলকে পছন্দ করে নিতে বললেন। জুলিয়ার জন্য মোজা আর আন্ডারওয়ার ছাড়া কিছুই রইল না। জুলিয়ার কাছে জীবনটা তখন থেকেই বেশ ঘৃণার। জোর করে তাকে দিয়ে কিছু করানোটাও ঘৃণার, এমনকি বাবার সাথে গাড়ি করে যাওয়াটাও ঘৃণার, যে কিনা বলেছিল তারা পুতুল দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু কথাটা মিথ্যা ছিলো। তার বাবা বলতো, সে তার মায়ের মত একগুঁয়ে। মা বলতো, সে ছিলো বাপের বিপরীত স্বভাবের। আরো ছিল তার বাবা-মার মত নিজের মতের ওপর অবিচল, বলতো তার দাদা। আর বোন বলতো, সে প্রভুত্বপরায়ণ। আর এতসব কারণেই প্রথম কয়েক মাস নিজেকে সে পুরোপুরি আবদ্ধ করে রেখেছিলো এই আশ্রয়স্থলে।

‘আমি তাকে দেখিয়ে দেব যে আমিও পারি।’

বাবার বিরুদ্ধে মনে মনে একরকম চ্যালেঞ্জ পোষণ করছিল সে। যখন তার মা চিৎকার করে বলতো, ‘জুলিয়া থালাবাসন ধোয়া হয়েছে?’

সে ভাবত, ‘বাড়িতে কি জুলিয়া ক্যারল একাই বাস করে? বাসন কি অন্য কেউ ধুতে পারে না?’

জুলিয়া আশ্রয়কেন্দ্রে কেন ফিরে গেল সেই কথাগুলো বর্ণনা করা জটিল। সত্যি বলতে সে লন্ড্রি করা ও টয়লেট পরিস্কার করার মত কাজ একদম পছন্দ করত না। তা সত্ত্বেও সপ্তাহে দু’তিনদিন সে সকাল সাতটার মধ্যেই বিছানা ছাড়ে এবং স্কিড রো কিংবা প্রিন্স এভিনিউয়ের দিকে হাঁটতে থাকে যাতে সে নেশাগ্রস্ত, মানসিক রোগী ও অন্যান্য রোগে ভোগা মানুষের মাঝে খাদ্য ও কম্বল বিতরণ করতে পারে। খাওয়া শেষে নোংরা সবকিছু পরিস্কার করার দায়িত্বও তার।

এতসব দায়িত্ববোধের জন্য লোকজন জুলিয়াকে পছন্দ করে। যেসব লোকের সেবা করে জুলিয়া, তাদের কাছে সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ।

ক্যান্ডিস জিজ্ঞেস করল, 'সব ঠিকঠাক তো মেয়ে? মেয়রের সাথে আমাকে একটু সাক্ষাৎ করতে যেতে হবে।'

'অবশ্যই।'

গাড়ির ওপর ময়লার বস্তাটা রাখলো জুলিয়া। তারপর সিট থেকে খাতাকলম সহ, অক্ষম ও অসহায়দের জন্য আবেদনপত্র পূরণের ফর্মগুলো নিলো। তারপর হোস্টেলে ফিরে গেল।

পরবর্তী কয়েকঘন্টা জুলিয়া কাগজপত্রের কাজগুলো সম্পন্ন করলো এবং ফোন করে রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থাগুলোর সাথে জীবনমান উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনা সেরে নিলো। জুলিয়ার অনেক বন্ধুবান্ধবই তার এ ধরণের কাজ নিয়ে উপহাস করে (তাদের মতে গৃহহীন লোকগুলো অলস প্রকৃতির হয়) কিন্তু তারা যা জানে না তা হলো, রাস্তায় বসবাসরত লোকের মাঝে কারো চরিত্রে গভীর কোন খারাপ গুণ থাকে না, তারা বরং কিছু বাজে অভ্যাসের মধ্য দিয়ে যায়। যেমন- পুলিশের সাথে ঝগড়া, খারাপ মানুষের সাথে চলাফেরা। স্কুল কিংবা কাজে মিস করা। কেননা, ঘড়িতে এলার্ম সেট করাও তাদের অনেকের কাছেই বেশ বিরক্তিকর।

জুলিয়া কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নয়। তবুও সে লোকগুলোর অনেকের মাঝেই অন্তর্নিহিত মানসিক সমস্যা দেখতে পেত। যেমন- বিস্মৃতি, হতাশা কিংবা বিভ্রম।

একবার এক লোককে জুলিয়া এখানে আনার পর তার মা জিজ্ঞেস করেছিলো, 'প্রজাতন্ত্রের যেকোন মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা নেবার পর তার অবস্থা কেমন হতে পারে? এরা সকলেই তো হয় রাস্তায় কিংবা জেলে ছিলো।'

জুলিয়া কোন জবাব দিতে পারেনি। হঠাৎ বেট্রিস অলিভারের কথা মনে পরে গেল তার। সেই মেয়েটি, যে কিনা আইসক্রিম আনতে বাইরে গিয়েছিলো,

তারপর আর ফেরেনি। টেলেক্সের নিউজটা পড়ে জুলিয়া জানতে পেরেছিলো মেয়েটা ছিলো হতাশাগ্রস্ত, যা কিনা সত্যিকারার্থেই ভয়ানক এক মানসিক রোগ এবং এর জন্য তাকে চিকিৎসাও দেয়া হয়েছিলো। এটা ছাড়াও টেলেক্স থেকে অলিভারের ব্যাপারে যতটা সম্ভব জেনে নিয়েছিল। সাহায্যকারী একটি পত্রিকা অলিভারের বাবা-মার সাথে কথা বলার জন্য একজন রিপোর্টার পাঠিয়েছিল। সবাই তখন অলিভারকে খুজতে ব্যস্ত (সবাই জীবিত খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিলো, কিন্তু কেউই আশায় বুক বাধতে পারছিলো না)। হতাশার জন্য অলিভার পূর্বে চিকিৎসা নিয়েছিল এ বিষয়টা তার মা ই সর্বপ্রথম সবাইকে অবহিত করে।

কলেজে পড়ার সময় জুলিয়া একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিলো। অবশ্য সে কাউকেই এটা জানায়নি। কারণ বাড়ির বাইরে বাস করাটা যতটা সোজা মনে হয় ততটা সোজা ছিলো না। আর এ নিয়ে কাউকে বলতে এক প্রকার লজ্জাই পাচ্ছিলো। চিকিৎসকের চেম্বারে সবকিছু বিস্তারিত বললো সে। সবটা শোনার পর চিকিৎসক হাই তুললেন। তারপর বেশ কিছু পরামর্শ দিলেন যেগুলো তার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলো, (সেগুলোর মধ্যে ছিলো- দলবেঁধে চলা, সবসময় নতুন কিছু করা, নিত্যনতুন হেয়ারস্টাইল দেয়া, বেশি বেশি হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করা) এর ফলে জুলিয়া বুঝতে পেরেছিলো তার সমস্যাগুলো জাগতিক, এবং কলেজের অন্যান্য তরুণ তরুণীদের মাঝেও অনেকেই এরকম বেশকিছু বিরক্তিকর সমস্যায় ভোগে।

সে ভাবলো, যদি সে কখনো হারিয়ে যেত, অথবা ভাগ্যের ফেরে অপহৃত হত, তাহলে কোন রিপোর্টার কি কখনো জানতো সে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা নিয়েছিলো? কিংবা সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা বলাটাই কি প্রমাণ করে কেউ মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত? বিষয়টা অবাক লাগলো জুলিয়ার কাছে।

‘তাকে অপহরণ করা হয়েছে! আমার কথাটা কাগজে লিখে রাখো।’